ISSN 2072-3334
Development Compilation
Vol. 08. No. 01. February 2013

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও বাংলাদেশের উপন্যাস

শামসুজ্জামান মিলকী*

সারসংক্ষেপঃ ১৯৭১-এর স্বাধীনতাসংগ্রামের পূর্বে সংগঠিত আন্দোলনের মধ্যে ১৯৬৮-১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানই বাংলাদেশের মানুষকে সবচেয়ে বেশি জাগরিত করেছিল। ১৯৬২ থেকে ১৯৬৮ পর্যন্ত সংঘটিত রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে ছাত্রসমাজের ভূমিকা ছিল গৌরবোজ্জ্বল। সেই গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকারই ফসল ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে উত্থাপিত ছাত্রসমাজের '১১ দফা দাবি'। এ ১১ দফার মাধ্যমেই পূর্ববাংলার ছাত্রসমাজ আন্দোলনের একটি গতিশীল রূপরেখা ও কর্মসূচিকে জনসম্মুখে নিয়ে আসে। এ সময়কালের ব্যক্তিক-পারিবারিক-সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অবস্থাকে মূর্ত করেছেন বাংলাদেশের কথাশিল্পীগণ এঁদের মধ্যে জহিরুল ইসলাম *অগ্নিসাক্ষীতে* (১৯৭৩), আহমদ ছফা (১৯৪৩-২০০১) *ওঙ্কার* (১৯৭৫), আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-১৯৯৭) *চিলেকোঠার সেপাই* (১৯৮৭)-এ সেই সময়কে বাণীবদ্ধ রূপদান করেছেন। জহিরুল ইসলামের *অগ্নিসাক্ষী* ষাটের দশকের রাজনৈতিক ঘটনাবলির প্রামাণ্য বিবরণমূলক উপন্যাস। একটি মধ্যবিত্ত পরিবারকে কেন্দ্র করে জাতীয় ঘটনাবলিকে রূপায়িত করেছেন ঔপন্যাসিক। *অগ্নিসাক্ষী* তাই বাঙালির জাগরণের প্রত্যক্ষ দলিল বলেই রাজনীতি সচেতন মহলে বিবেচিত। আইয়ুবি দুঃশাসনে বাঙালি মানসের যে জারণ প্রক্রিয়া চলছিল তারই বিজারণ প্রতিক্রিয়ার প্রতীক-চিত্রসম্বলিত উপন্যাস আহমদ ছফার *ওঙ্কার*। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের *চিলেকোঠার সেপাই*-এর পটভূমি '৬৯-র গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে সামাজিক-রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ। গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা ও বগুড়া জেলার চরাঞ্চলের ঘটনাপ্রবাহ একসূত্রে গ্রন্থিত। গণআন্দোলনের প্রেক্ষাপটে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের অংশগ্রহণে বাঙালির স্বাধীনতাপূর্ব সময়কাল মূর্ত হয়ে উঠেছে।

বন্দিত্বের শৃঙ্খল ছিন্ন করে মুক্ত হবার যুদ্ধে আমাদের বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল আমাদের ভাষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ, অর্থনৈতিক মুক্তির তাগিদ এবং বাঙালি হিসেবে আমাদের সুদীর্ঘ গৌরবময় আমাদের ঐতিহ্য সচেতনতা। যদিও রাজনৈতিক নেতা ও তাদের ভাড়াটে বুদ্ধিজীবীরা এ অনুপ্রেরণার কৃতিত্ব নিয়ে কামড়াকামড়িতে লিপ্ত হতে পারেন, কিন্তু সাধারণ মানুষের যে আত্মত্যাগ ও দুঃখদহন, তাদের যে নীরব প্রতিরোধ মূলত তা ছিল আমাদের জাতীয় আত্মপ্রতিষ্ঠার মৌল উপাদান। প্রকৃত যারা সাহিত্যিক তারা কোনো ভাড়াটে বুদ্ধিজীবীর মতো নিজেকে জাহির করা বা ইতিহাস বিকৃতির মতো জঘন্য অপরাধে লিপ্ত হতে পারেন না। অভিঘাতময় সময়ের শব্দরূপ সৃষ্টি করতে গিয়ে একজন সাহিত্যিক ইতিহাসের সঙ্গে তাঁর

* সহকারি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়।

সাহিত্যকর্মের চরিত্রদের গ্রথিত করে ঘটনার বাস্তবতা ও কাল্পনিক বাস্তবতার ঐক্যসূত্রে সৃষ্টি করেন চিরকালীন সাহিত্য। লেখকের প্রকাশভঙ্গিই এক্ষেত্রে হয়ে ওঠে রাজনৈতিক সত্য ও শিল্প সত্য। বাংলাদেশের সাহিত্যে ১৯৪৭ সালের দেশভাগ একটি স্বতন্ত্র ও নবজাগরণমূলক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটযুক্ত চেতনার সন্নিবেশ ঘটায়। বিভাগোত্তর বাংলাদেশে স্বাধিকার আন্দোলনের সবচেয়ে উজ্জ্বল সময় ষাটের দশক। '৬২-র ছাত্র আন্দোলন থেকে শুরু করে '৬৬-র ছয়দফা, '৬৮-র আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, '৬৯-র গণঅভ্যুত্থান এবং '৭০-র জলোচ্ছ্বাস ও নির্বাচনের মতো ঘটনাবলি পূর্ববাংলার মানুষকে প্রতি মুহূর্তে জাগ্রত ও শাণিত করেছে— ফলশ্রুতিতে '৭১-র মহান মুক্তিযুদ্ধ। এসব ঘটনা ও কার্যকলাপ অধিকার-বঞ্চিত বাঙালিকে উজ্জীবিত করেছে। ১৯৭১-এর স্বাধীনতাসংগ্রামের পূর্বে সংগঠিত আন্দোলনের মধ্যে ১৯৬৮-১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানই বাংলাদেশের মানুষকে সবচেয়ে বেশি জাগরিত করেছিল। এ সময়কালের ব্যক্তিক-পারিবারিক-সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অবস্থাকে মূর্ত করেছেন বাংলাদেশের কথাশিল্পীগণ এঁদের মধ্যে জহিরুল ইসলাম *অগ্নিসাক্ষীতে* (১৯৭৩), আহমদ ছফা (১৯৪৩-২০০১) *ওঙ্কার* (১৯৭৫), আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-১৯৯৭) *চিলেকোঠার সেপাই* (১৯৮৭)-এ সেই সময়কে বাণীবদ্ধ রূপদান করেছেন।

১৯৬৮ সালের ১ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় সরকারের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় যে, জাতীয় স্বার্থ-বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত করার অভিযোগে কতিপয় রাজনীতিবিদ ও সরকারি চাকুরিজীবীদের গ্রেফতার করা হয়েছে এবং এদের পরিকল্পনা সরকার নস্যাৎ করে দিয়েছে। ভীত-সন্ত্রস্ত স্বৈরাচারি শাসকচক্র ছয়দফার মধ্যে জাতীয় আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন লক্ষ্য করেই হয়ে ওঠে অধিকতর হিংস্র ও আক্রমণাত্মক। আক্রমণের চরম প্রকাশ—'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'। ঐ মিথ্যা মামলায় আওয়ামীলীগ সভাপতি শেখ মুজিবসহ মোট ৩৫ ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করা হয়। প্রায় প্রতিদিন খবরের কাগজে বড় বড় শিরোনামে এ মামলার সংবাদ প্রকাশিত হতে থাকে। সারাদেশে তা প্রধান আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'র প্রতিক্রিয়ায় আইয়ুব-বিরোধী গণ-বিক্ষোভে সমগ্র পূর্ববাংলা ফেটে পড়ে। বাংলা বর্ণমালা ও বানান সংস্কার প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক গঠিত কমিটির অন্যতম সদস্য অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই ও অধ্যাপক সৈয়দ এনামুল হক এর অসম্মতি থাকা সত্ত্বেও বাংলা বর্ণমালার মধ্য থেকে ৭টি (ঙ, ন, ৎ, ষ, ঈ, ঐ, ঔ) বর্ণ বর্জন করার সুপারিশ করা হয়।[1] এ ঘটনায় দেশের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীমহলসহ সকল স্তরে ব্যাপক সমালোচনা হয়। এ পর্যায়ে দেশের ৪২ জন সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, শিল্পী ও সাংবাদিক এক যুগ্ম বিবৃতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এহেন সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন। একই সঙ্গে এর প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতি সংসদ একটি প্রচারপত্র প্রকাশ করে। এর পরপরই হাসান হাফিজুর রহমান 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল সমীপে একটি খোলা চিঠি' প্রেরণ করেন। এদিকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাকে কেন্দ্র করে পূর্ববাংলার জনসাধারণ প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত হতে থাকে। তার ওপর বাংলা ভাষাকে নিয়ে নতুন ষড়যন্ত্র দেশবাসীকে আরও ক্ষিপ্ত ও হতাশ করে তোলে। ১৯৬২ থেকে ১৯৬৮ পর্যন্ত সংঘটিত

রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে ছাত্রসমাজের ভূমিকা ছিল গৌরবোজ্জ্বল। সেই গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকারই ফসল ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে উত্থাপিত ছাত্রসমাজের '১১ দফা দাবি'। এ ১১ দফার মাধ্যমেই পূর্ববাংলার ছাত্রসমাজ আন্দোলনের একটি গতিশীল রূপরেখা ও কর্মসূচিকে জনসম্মুখে নিয়ে আসে। 'শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি ও বৈষম্যদূরীকরণ', 'প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা', 'বাক-স্বাধীনতা, ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা', 'স্বায়ত্তশাসন প্রদান করতঃ সাব ফেডারেশন গঠন', 'বৃহৎশিল্প জাতীয়করণ', 'কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর ন্যায্য দাবি', 'পূর্ব-পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণ', 'জরুরি আইন প্রত্যাহার ও বিভিন্ন সামরিক চুক্তি (সিয়াটো, সেন্টো, পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি) বাতিল' এবং 'দেশের কারাগারে আটক সকল ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, রাজনৈতিক কর্মী ও নেতৃবৃন্দের অবিলম্বে মুক্তি, গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ও হুলিয়া প্রত্যাহার' এবং 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাসহ সকল রাজনৈতিক কারণে জারিকৃত মামলা প্রত্যাহার' দাবিনামার অন্তর্ভুক্ত ছিল।[২] ১৯৬৯ সালের ১৭ জানুয়ারি পূর্ববাংলার সংগ্রামী ছাত্রসমাজ 'দাবী দিবস' পালন করে। এর সমর্থনে আহুত সমাবেশের পর ছাত্রদের মিছিল সরকার কর্তৃক জারিকৃত ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে অগ্রসর হলে ছাত্রদের ওপর পুলিশের বেপরোয়া লাঠিচার্জ ও কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করলে ছাত্রসমাজ ঐতিহাসিক বটতলার প্রতিবাদ সমাবেশ করে। ছাত্রদের ওপর হামলার প্রতিবাদে সর্বদলীয় ছাত্রসমাজের পক্ষ থেকে পরদিন ১৮ জানুয়ারি ঢাকার সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রধর্মঘট পালনের আহ্বান জানানো হয়। ১৮ তারিখের ধর্মঘটের সমর্থনে ঢাকা শহরের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে জড়ো হয়ে মিছিল সমাবেশ করে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে। এতে পুলিশ ও ছাত্রদের মধ্যে সংঘর্ষ ব্যাপক আকার ধারণ করে। ছাত্রদের ওপর হামলার প্রতিবাদে আওয়ামীলীগ (৬ ছফাপন্থী), ঢা.বি. শিক্ষক সমিতি, মওলানা ভাসানী ও বিচারপতি মাহবুব মোর্শেদসহ বিভিন্ন ছাত্রসংগঠনের ২৫ জন ছাত্রনেতা বিবৃতি দেন। সর্বদলীয় সংগ্রামী ছাত্রসমাজ ২০ জানুয়ারি প্রদেশব্যাপী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মঘটের আহ্বান জানায়। ২০ জানুয়ারি ছাত্রছাত্রীরা লাঠি আর লোহার রড নিয়ে মিছিল বের করে। মিছিলটি কার্জন হল পার হয়ে রশিদ বিল্ডিং-এর কাছে পৌঁছলে পুলিশ হামলা চালায়। ছাত্রমিছিলের ওপর পুলিশ হামলা চালালে ছাত্ররা পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধে লিপ্ত হয়। ছাত্রদের কাছে পুলিশ যখন পরাস্ত হয়ে পালিয়ে যেতে থাকে ঠিক তখনই ঘটে বিপর্যয়। পুলিশ বাহিনীর পিছনে ধাবমান ছাত্রদের ওপর পুলিশ পেছন থেকে আকস্মিকভাবে গুলোবর্ষণ করে। সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান নিহত হন এবং আরও তিনজন ছাত্র গুরুতরভাবে আহত হন।[৩] আসাদ নিহত হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়লে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ রাজপথে নেমে আসে। কেন্দ্রীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ সারাদেশে তিনদিনব্যাপী শোক কর্মসূচি ঘোষণা করে। ২১ জানুয়ারি ঢাকায় পূর্ণদিবস হরতাল, ২২ থেকে ২৪ জানুয়ারি শোকদিবস পালন ও সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট এবং ২৪ জানুয়ারি সারা দেশে হরতাল পালনের সিদ্ধান্ত হয়। ২৪ জানুয়ারি ঢাকা শহরে ঐতিহাসিক গণ-অভ্যুত্থানের সূচনা ঘটে। সচিবালয়ে বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলো চালালে রুস্তম আলী, মতিয়ূরসহ পাঁচজন নিহত হলে বিক্ষোভকারীরা লাশ নিয়ে পুনরায় মিছিল বের করে। আন্দোলনকারীরা সরকার সমর্থিত পত্রিকা অফিসসমূহ, জাতীয় পরিষদ সদস্যের বাড়ি এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার রাজসাক্ষীর

হোটেলে অগ্নিসংযোগ করে। পরিস্থিতির এ সক্রিয় ও চলমানতা অনুধাবন করে আইয়ুব খান 'গোলটেবিল বৈঠক' অনুষ্ঠানের প্রস্তাব করেন। ৯ ফেব্রুয়ারি ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ 'শপথ দিবস' পালন করে এবং ১১ দফা দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ তারিখে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হককে ঢাকা সেনানিবাসে হত্যা করা হয়। ১৬ ফেব্রুয়ারি মওলানা ভাসানী পল্টন ময়দানের জনসভায় শেখ মুজিবকে মুক্তিদানের দাবি তোলেন। জনসভা থেকে ঘর-ফেরত জনতা সরকারি পদস্থ কর্মকর্তার বাসভবন ও বিভিন্ন সরকারি ভবনে অগ্নিসংযোগ করে। পরিস্থিতি প্রাদেশিক সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে সন্ধ্যায় সেনাবাহিনী শহরের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করে এবং সান্ধ্য আইন জারি করে।[৪] ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন প্রক্টর ড. শামসুজ্জোহাকে হত্যা করে পাকিস্তানি আর্মি-পুলিশ। এ সংবাদ ঢাকায় প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সান্ধ্য আইন অমান্য করে আপামর জনতা রাজপথে নেমে আসে। সমগ্র রাতব্যাপী ঢাকা শহর শ্লোগান ও বুলেটের আওয়াজে প্রকম্পিত হয়। সেনাবাহিনীর গুলোকে প্রতিহত করার জন্য উন্মত্ত জনতা ঢেউটিন নেয় রাস্তায় নেমে পড়ে। সরকার পরিচালিত পত্রিকায় মৃতের সংখ্যা ৩৯ জন বলা হলেও সে রাতে কত মানুষ যে নিহত হয় তার সঠিক সংখ্যা আজও উদঘাটিত হয় নি। সরকার এ গণ-জোয়ারে সন্ত্রস্ত হয়ে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারের ঘোষণা দেয় এবং ২২ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দীদের মুক্তি দেয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ রেসকোর্স ময়দানে সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের গণসংবর্ধনায় 'সংখ্যাসাম্য নয়, জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব চাই'—এ দাবি জানিয়ে দশ লক্ষ লোকের জনসমুদ্রে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান ছাত্রসমাজের ১১ দফার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। উক্ত জনসভায় পূর্ববাংলার পক্ষ থেকে শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দেয়া হয়।[৫] দেশে চলমান জটিলতা নিরসনকল্পে আইয়ুব খান আহুত সর্বদলীয় গোলটেবিল বৈঠকে শেখ মুজিব আওয়ামী লীগের ছয়দফা এবং ছাত্রসমাজের ১১ দফা দাবির সমন্বয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করেন। দুই পর্যায়ে অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে কেন্দ্রীয় সরকার ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলসমূহ শেখ মুজিবের দাবি গ্রহণে অসম্মত হয়। তবে সার্বজনীন ভোটাধিকার ভিত্তিক প্রত্যক্ষ নির্বাচন এবং সংসদীয় গঠনতন্ত্রের পুনঃপ্রবর্তন দাবি দু'টি গৃহীত হয়। ১৯৬৯ সালের ২৪ মার্চ সম্পূর্ণ অনিয়মতান্ত্রিকভাবে সামরিক বাহিনীর প্রধান জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। ইয়াহিয়া খান পুনরায় সামরিক শাসন জারি করেন।[৬] দ্বিতীয়বারের মতো সামরিক শাসন জারি হলেও সারাদেশে বড় ধরনের কোনো প্রতিবাদ মিছিল সামবেশ অনুষ্ঠিত হয় নি।

এ সময়ের প্রেক্ষাপটে লেখা জহিরুল ইসলামের *অগ্নিসাক্ষী* ১৯৬৯-ই প্রকাশিত হয়েছিল আগস্ট মাসে, তখন বাংলাদেশ তথা পূর্ববাংলায় দ্বিতীয় বারের মতো সামরিক শাসন জারি হয়েছে। উপন্যাসের সূত্রপাত এক মধ্যবিত্ত পরিবারে, যে পরিবারের প্রধান একজন সরকারি চাকুরিজীবী—সমাজ-রাষ্ট্রের প্রতি যার রয়েছে কমিটমেন্ট। ফলত ষাটের দশকের ঢাকা শহরে একখণ্ড জমি তার থাকলেও বাড়ি করার মতো সঙ্গতি তার হয় না। এ পরিবারেরই বড় মেয়ে মধুরিনা, একমাত্র ছেলে বুলন, ছোট মেয়ে ফারিয়া এবং বুলনের বন্ধু বিপ্লবী আদর্শে বিশ্বাসী

মুনির সুলতানকে ঘিরে গড়ে উঠেছে উপন্যাসের অন্তর্বয়ন ও বহিঃরঙ্গ। ১৯৭১ বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হবার আগেই ঔপন্যাসিক লোকান্তরিত হলেও বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের পরিণতিকে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন বলেই জহিরুল ইসলাম রূপায়িত করেছেন বাঙালির সংগ্রামীসত্তাকে। বাঙালির জাগরণের প্রথম স্মৃতিসৌধ শহীদ মিনারে তাই এ উপন্যাসের পরিসমাপ্তি, 'সমকালস্পর্শী অভিজ্ঞতার প্রবর্তনায় *অগ্নিসাক্ষী* হয়ে উঠেছে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের মৌন আবেগের শিল্পরূপ।[৭] ষাটের দশকের প্রেক্ষাপটে একজন কিশোরীর তরুণী হয়ে উঠার মধ্যে পারিবারিক-সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির বর্ণনায় উপন্যাসের কথাবস্তুর আরম্ভ হলেও মধ্যবিত্তের আত্মসম্মানবোধ, ভেতরে ভেতরে বিদ্রোহ-চেতনা, সমাজ-রাষ্ট্রের কাঠামোবদ্ধতায় অপ্রাপ্তিজনিত হতাশা ও ক্ষোভ এবং নব্য-সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তের বিপ্লবের বর্ণনাই এ উপন্যাসের সারাৎসার। যে দ্বন্দ্বাত্মক ঘটনার মধ্য দিয়ে বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের পথকে উন্মুক্ত করেছিল *অগ্নিসাক্ষী* তারই প্রচ্ছদচিত্র।[৮]

*অগ্নিসাক্ষী*র অন্যতম প্রধান চরিত্র মধুরিনা বি.এ অর্নাসের ছাত্রী—তার মনোগত পরিবর্তনকেই আমরা বাঙালি মধ্যবিত্ত মানসিকতার পরিবর্তন বলতে পারি। মধুরিনার সমকালীন রাজনীতি বিষয়ে ধারণা ছিল 'ছাত্র-পলিট্রিক্স করা মানে গোল্লায় যাওয়া'। অথচ সময় ও সমাজ পরিবর্তনের ধারায় মধুরিনা হয়ে উঠে রাজনীতি সচেতন, অধিকার আদায়ের দাবিদার, রাজপথের দুরন্ত মিছিলের সহযাত্রী। মধুরিনার এ জাগরণ বাঙালি মানসিকতারই জাগরণ, বাঙালির সচেতনতার বহিঃপ্রকাশ। মধুরিনার ভাই বুলন ইকনমিক্সের ছাত্র। পারিবারিক অসামর্থের দেয়াল ভাঙার চিন্তায় সে ভারাক্রান্ত হয়। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী শিক্ষাজীবনের নিগড়ে সে বাধা পড়ে থাকে। গণআন্দোলনে আইয়ুব মোনায়েম শাহীর পুলিশের গুলোতে শহীদ হয় বুলন। তারই ছোটবোন ফারিয়া—স্কুলপড়ুয়া হলেও এখনই বিপ্লবী মুনিরের সঙ্গে 'সারা শহর চষে বেড়ায়'। প্রবল গণআন্দোলনে শরিক থেকে স্বীয় অস্তিত্বের জানান দেয়। মধুরিনা-বুলন-ফারিয়া এ তিনজনের সঙ্গে তিন ধরনের সম্পর্কে যুক্ত মুনির সুলতান। সে মধুরিনার ব্যক্তিগত পছন্দের মানুষ, বুলনের বন্ধু ও সহযোদ্ধা এবং ফারিয়ার রাজনৈতিক শিক্ষাগুরু। সমাজবিপ্লবী মুনির গণআন্দোলনে মারাত্মক আঘাতপ্রাপ্ত হয়।

রাজনীতি ও ছাত্র আন্দোলন সম্পর্কে মুনিরের ধারণা সুস্পষ্ট। সঙ্কট-সমস্যা আর দুরাবস্থার নিরসনের জন্যই রাজনীতি করে সে। তার মতে 'ছাত্র দাবী-দাওয়া নিয়েই ছাত্র-পলিট্রিক্স।' মুনিরের এ রাজনীতি সচেতনতা ও কর্মকাণ্ডই তাকে আন্দোলনের নীতি-নির্ধারক পর্যায়ে উন্নীত করে। যদিও বামপন্থী কর্মী হিসেবে তার 'ছক-আঁটা, পরিকল্পিত' বক্তব্য মধুরিনার মনে কোনো রাজনৈতিক চেতনা বা আসক্তির জন্ম দিতে পারে না। ছাত্রজীবনেই প্রেম ও ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে উদাসীন, তরুণীদের কাছে 'নিরস কাঠখোট্টা' খেতাব প্রাপ্ত মুনির সুলতান আদর্শবাদী ছাত্রনেতা থেকে '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের ধাক্কায় একজন নিবেদিত প্রাণ কর্মীতে পরিণত হন। অন্যদিকে এনএসএফ নেতা সাদিক আইয়ুব-মোনায়েম খানের দালাল। যে কি-না রাজনৈতিক চরিত্রের ভেতরেও ধারণ করে ঘৃণ্য নারী-লোলুপতা। তাই বিরুদ্ধবাদী মনোভাব পরিলক্ষিত হয়েছে মুনির-সাদিকের মধ্যে।

'৬২-র শিক্ষা আন্দোলন, '৬৬-র ছয় দফার পথ বেয়ে ষাটের দশকের রাজনৈতিক আন্দোলন '৬৮-'৬৯ এ যখন তুঙ্গে তখনও আন্দোলন তথা লড়াই-সংগ্রামের পরিণতি সম্পর্কে বাঙালি মধ্যবিত্ত মানসে ছিল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজে ছিল সংশয়। এরই প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় *অগ্নিসাক্ষী*তে:

> বড় বড় চোখা চোখা বুলি আড়ালে একটা বিরাট ফাঁকিতে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, শোষণহীন সমাজ ইত্যাদি বানোয়াট কথার ভেল্কী শোনাতে বেশ লাগে। কিন্তু বাস্তবে সেটা মেকী পয়সার মত অচলমার্কা হয়ে পড়ে থাকে।[৯]

'বাঁচতে গেলেই সংগ্রাম করতে হবে' এ মৌল আবেগে তাড়িত হয়ে বাঙালি ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আন্দোলনে, ফলে সৃষ্টি হয়েছিল গণঅভ্যুত্থান। এ একটা বিষয়ে পূর্ববাংলার সচেতন 'মানুষের সংগ্রামী অস্তিত্ব' যোগ দিয়েছিল লড়াই-এ, সংগঠিত হয়েছিল পশ্চিমা শাসকশ্রেণীর শোষণের বিরুদ্ধে। অধিকার সচেতন বাঙালি ছাত্রসমাজ তখন 'শিক্ষা সংকোচন নীতি খতম করো' ব্যানার আর স্বাধিকারের দাবিতে রাজপথে নেমে শ্লোগান তুলেছিল 'আমাদের দাবী মানতেই হবে। ছাত্রের সংগ্রাম, কৃষকের সংগ্রাম, শ্রমিকের সংগ্রাম।' (*অগ্নিসাক্ষী*, পৃ.২০)

১৯৬৮-'৬৯ সালের দিকে নব্য-সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার দ্বারা আক্রান্ত হয় ভিয়েতনাম। বাংলাদেশের সচেতন রাজনৈতিক কর্মী মহলে এ ঘটনা রেখাপাত করে। যার উল্লেখ আমরা *অগ্নিসাক্ষী*তে পেয়ে থাকি। 'সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদ—ধ্বংস হোক, লাখো মানুষ ভুখা রয়—এ আজাদী মিথ্যে হয়, ভিয়েতনাম বীর জনতা—জিন্দাবাদ' (*অগ্নিসাক্ষী*, পৃ.২৯)। এরূপ আন্দোলন ও কার্যক্রমের চিত্র পাওয়া যায় *কালবেলা* উপন্যাসেও। উপন্যাসের নায়ক অনিমেষ বামপন্থী রাজনীতি ধারার কর্মী, যে কি-না সশস্ত্র বিপ্লবের আশায় কৃষকদের সংগঠিত করতে গ্রামে এবং চা-শ্রমিকদের সচেতন করতে ডুয়ার্সের জঙ্গল এলাকায় কাজ করে। *অগ্নিসাক্ষী*র মুনির-বুলনও কৃষকদের সচেতন করতে গ্রামে যায়। ভিয়েতনাম ও অন্যান্য মুক্তিকামী সংগ্রামী জাতির সার্বিক সাফল্য এবং সাম্রাজ্যবাদের পরাভব সম্পর্কেও তারা নিশ্চিত আস্থা ব্যক্ত করেছে।

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্যমূলক নীতি এবং যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে বাঙালির আবেগ সেদিন প্রকাশ পেয়েছিল কান্নায় নয়, দ্রোহে-প্রতিবাদে-বিক্ষোভে। সারা দেশের মানুষের ভেতরের আবেগের প্রবাহ ছিল একমুখী—আন্দোলনমুখী। বাঙালি সেদিন বুঝতে পেরেছিল অধিকার কেউ কাউকে দেয় না, আদায় করে নিতে হয়:

> সারা দেশব্যাপী মানুষ আজ এমন এক স্তরে এসে পৌছেছে, যেখানে কান্নার কানাকড়িও মূল্য নেই। কান্না নয়, হাতের কব্জিতে শক্তি সঞ্চয় করে হুঙ্কার দিতে হবে। নিজেকে সবকিছু জয় করে নিতে হবে।[১০]

অন্যদিকে এনএসএফ কর্মীরা সহজেই সরকারের সুযোগ-সুবিধা লাভ করতো। যার প্রমাণ সাদিক চাটার্ড একাউন্টেসিতে অনেক ব্রিলিয়ান্ট ছাত্রদের বাদ দিয়ে বিদেশ থেকে হায়ার ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পায়। সেই এনএসএফ-এর প্রতিষ্ঠিত পাণ্ডারা তখন টাকা আর সুবিধার লোভ দেখিয়ে

আন্দোলন-শিবিরে ফাটল ধরাতে তৎপর ছিল। এক্ষেত্রে কিছুটা কাজ হাসিলও করেছিল সাদিকের মতো মানুষেরা। বাস্তবিকই কিছু ছাত্রনেতা সেদিন আন্দোলনের পথ পরিহার করেছিল। কিন্তু সেই কুচক্রীমহলের তৎপরতায় মোহান্ধ-স্বার্থপর-লোভীর সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য। তারচেয়ে বরং 'জীবনের শেষ রক্তটুকু পর্যন্ত দিয়েও ছাত্রদের সংগ্রামী অস্তিত্ব বজায় রেখে ব্যাপক ছাত্র-অসন্তোষ, শিক্ষা সঙ্কোচন, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার, সার্বজনীন ভোটাধিকার, মৌলিক অধিকার, কৃষক-শ্রমিক তথা মেহনতী জনসাধারণের রুটি-রুজির সংস্থান এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী নিয়ে সংগ্রাম' এগিয়ে চলে। স্বৈরাচারি শাসকগোষ্ঠীর স্টিম রোলারকে তুচ্ছ করে দূর্বার গণআন্দোলন গড়ার পথ তৈরি হয়।

ঘুষ-দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছিল স্বৈরাচারি সরকারের প্রতিটি অফিস। তাই আত্মসম্মানবোধ উজ্জীবিত বুলন-মধুরিনার বাবা বলেন: 'ছেলে আন্দোলনে মেতে উঠেছে' কি দোষ দেবো বলো। আমাদের অফিসারদের ঘুষের বহর দেখলে আমারই পথে নেমে আমলাদের কাণ্ড-কারসাজি পোস্টারে লিখে মিছিল করতে ইচ্ছে যায়। [...] রোড আর কনস্ট্রাকশন ডিপার্টমেন্টের আমাদের সহকর্মী বন্ধুরা ফুলে ফেঁপে ঢোল। বাড়ি গাড়ি কি না হচ্ছে তাদের। বুঝলে গো স্বৈরাচারী শাসনে দেশ অধঃপাতে চলে যাচ্ছে।'[৮] এরই মধ্যে অপর একটি ঘটনা ছাত্র-শিক্ষক-বুদ্ধিজীবী মহলে ব্যাপক নিন্দার ঝড় তোলে। সরকার সমর্থিত এনএসএফ গুণ্ডাদের বর্বর আক্রমণের শিকার হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক। এ ঘটনার সঙ্গে সরকার-বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ যোগসাজস লক্ষণীয়। এ ঘটনার উল্লেখ *অগ্নিসাক্ষী*কে আরও বেশি প্রামাণ্যতা দান করেছে:

> বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট পাওয়া বিশ্ববিখ্যাত জ্ঞানী-গুণী অধ্যাপককে তাড়িয়েই ক্ষান্ত হয় নি, একদল গুণ্ডা দিয়ে তাঁকে এমন সাংঘাতিকভাবে আঘাত করেছে যে তিনি হাসপাতাল থেকে প্রায় পঙ্গু দেহে বেরিয়ে এসেছেন কোনোক্রমে। এ স্বৈরাচারী শাসকের ছাত্রগুণ্ডা আর কিছু ভাড়াটে গুন্ডার এ মিলিত গুণ্ডামী। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষও এ সব কুকীর্তির সঙ্গে জড়িত বেশ বুঝতে পারে মধুরিনা।[১১]

আন্দোলনকে স্তিমিত করতে স্বৈরাচারি সরকার রাজপথে গুলো করে মানুষ হত্যা করতেও দ্বিধাবোধ করে না। এখানে এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, আন্দোলনকারী মানুষগুলো নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও মিছিলে সামিল হয়েছে। *অগ্নিসাক্ষী* সেই সময়ের প্রত্যক্ষ দলিল: 'ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে যখন গুলোস্তানে গুলো করে স্বৈরাচারের পুলিশ মানুষ মারলো তখুনি সর্বপ্রথম চমকে উঠেছিল মধুরিনা। কে জানে কার কপালে কি ঘটবে, ঘটতে যাচ্ছে।'[১২] তবে আন্দোলনের মাধ্যমে স্বৈরাচারি শাসনের অবসান ঘটাতে সচেতন ছাত্রসমাজ সেদিন ব্যাপক গণজাগরণের লক্ষ্যে গ্রামে গিয়ে কৃষকদের সংগঠিত করে কৃষক বিদ্রোহের চেষ্টাও করেছিল। কেননা গ্রামভিত্তিক বাংলাদেশে কৃষক-শ্রমিকের অংশগ্রহণ ছাড়া কোনো কাজেই সফলতা আসা সম্ভব নয়। '*অগ্নিসাক্ষী*র লেখক তাঁর গ্রন্থে শেষ দিকে, বিশেষ করে কৃষক শ্রমিকের বিপ্লবী ভূমিকাকে প্রাধান্য দিতে চেয়েছেন এবং এমনকি মেহনতি মানুষদের লাল সালাম জানিয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের যে বিরাট বিস্তৃত রূপ তাকেও যথাযথভাবে চিত্রিত

করেছেন।'[১৩] তবে কৃষক আন্দোলন সংগঠিত করতে না পারলেও পূর্ববাংলার শ্রমিক অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল। আইয়ুবশাহীর জুলুমবাজিতে শ্রমিকরা ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়। আইয়ুবের উন্নয়ন দশক পালন ছিলো মূলত বিগত দশকের শাসন-শোষণের অসামঞ্জস্যতা, বৈষম্য এবং নিপীড়নকে আড়াল করার প্রয়াস এবং মাহাত্ম্য কীর্তন। 'ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের জেল-জুলুম, হুলিয়া আর ভিটেমাটি উচ্ছেদ করার চক্রান্ত চলছিল যার নজির পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোথাও আছে কি-না সন্দেহ' (*অগ্নিসাক্ষী*, পৃ.১২৫)। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সাংস্কৃতিক কর্মী, বুদ্ধিজীবীদের নিন্দা ও তৎপরতা। ১৯৬৭ সালে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক রবীন্দ্র সঙ্গীত বর্জন ঘোষণার প্রতিবাদে পূর্ব বাংলার বুদ্ধিজীবী-সৃষ্টিশীল-সাংস্কৃতিক কর্মী মহল থেকে নিন্দা ও প্রতিবাদের ঝড় উঠে। জহিরুল ইসলামের জবানিতে তা এরকম: 'সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক পটভূমিকে অস্বীকার করে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্তের নগ্ন হামলার নতুন রূপ দেখা ছিল রবীন্দ্র সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে।'[১৪] পূর্ববাংলার জনগণ যেন কোনো সঠিক খবর পেতে না পারে সেজন্য গণমাধ্যমে আরোপ করা হয় সেন্সরশীপ। যেকোনো ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে প্রতিহত করতে ১৪৪ ধারা জারি, মিছিল, বিক্ষোভ নিষিদ্ধের মাধ্যমেই নয় 'সংবাদ পত্রের কণ্ঠরোধ, বিরোধী সংবাদপত্র নাকচ' করে দেয় তারা। জহিরুল ইসলাম এ ঘটনাসমূহের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার চিত্রই চিত্রিত করেছেন *অগ্নিসাক্ষী*তে।

'৬৯-র গণঅভ্যুত্থানের পিছনে যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি ক্রিয়াশীল ছিল তা হলো আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। ছয়দফার রূপকার শেখ মুজিবুর রহমানসহ ৩৫ জনের নামে দায়েরকৃত এ মিথ্যা মামলার আসামিদের জেলে অমানুষিক নির্যাতন ও প্রহার করে। মধুরিনার মনে হয় 'দিনের পর দিন প্রহসনের একই অভিনয় ও ষড়যন্ত্র মামলার বন্দীদের জেল জীবনের নারকীয় দুদর্শার মধ্যে নিক্ষিপ্ত করা যেন একটা উৎপাত সৃষ্টি করে চলেছিল' (*অগ্নিসাক্ষী*, পৃ.১৩১)। *অগ্নিসাক্ষী* আসলে ৬-র দশকের রাজনৈতিক ঘটনার প্রামাণ্যচিত্র সমৃদ্ধ উপন্যাস। ছাত্রসমাজের ১১ দফা দাবি প্রণয়ন ও এর প্রেক্ষিতে দেশব্যাপী ছাত্রসমাজে অভূতপূর্ব সাড়া পরিলক্ষিত হয়। কেননা ১১ দফার আওয়ামী লীগের ৬ দফা, ন্যাপের ১৪ দফা এবং ছাত্রসমাজের ১৭ দফার চমৎকার সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। ১৯৬৯-র জানুয়ারি মাস রাজনৈতিক ঘটনাবহুল মাস। *অগ্নিসাক্ষী*তে এ ঘটনাগুলো সাংবাদিকের প্রতিবেদন আকারে বাণীবদ্ধ। ২০ জানুয়ারি ছাত্রমিছিলে পুলিশের গুলোতে শহীদ হয় ছাত্রনেতা আসাদ। উপন্যাসের বর্ণনায়:

> সেদিন সকাল দশটার দিকে ছাত্ররা যে সম্মিলিত মিছিল বের করলো তার ওপর পুলিশের চণ্ডমূর্তি ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। ছাত্রনেতা আসাদকে গুলো করে হত্যা করে পুলিশের এক উর্ধ্বতন জালেম অফিসার। [...] কিশোর, মতিউর রুস্তম, রাজশাহীর ডঃ শামসুজোহা আরো জানা অজানা বহু আন্দোলনকামী মানুষকে জল্লাদের মত হত্যা করতে থাকলো পুলিশ। আগরতলা মামলার বন্দী সার্জেন্ট জহুরুল হককে গুলো করে মারা হলো।[১৫]

মধুরিনার প্রণয়সিক্ত আচরণ মুনিরকে বিন্দুমাত্রও টলাতে পারে নি বিক্ষুব্ধ মুহূর্তে। কেননা মুনির বিশ্বাস করে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারলে মধুরিনা মুনিরেরই হবে। আন্দোলনে শেষ পর্যন্ত শহীদ হয় বুলন। মারাত্মকভাবে আহত হয় মুনির। বুলনের মৃত্যুতে ফারিয়া-মধুরিনা হারায়

তাদের ভাই, মুনির হারায় তার সহযোদ্ধা, পূর্ববাংলা হারায় তার একনিষ্ঠ কর্মী। কিন্তু এ হারানোর বেদনা মধুরিনা কিংবা তার পরিবারকে আচ্ছন্ন করতে পারে নি, কেননা মধুরিনা 'একটা পূর্ণ অনুভূতির আস্বাদ' পায়। আন্দোলনকারীদের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়: 'বুলন মুনির দুটি নাম—সংগ্রাম, সংগ্রাম। আসাদ মতিউর রুস্তম তিনটি নাম—সংগ্রাম, সংগ্রাম।'

বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের প্রতিশ্রুতিশীল লেখক আহমদ ছফা সমাজ সচেতনতা, চলমানতাবোধ ও গভীর নিষ্ঠার সমন্বয়ে তাঁর উপন্যাস *ওঙ্কার* হয়ে উঠেছে বাঙালি ও বাংলাদেশের শ্রেণীনির্ভর সমাজ-রাষ্ট্রের পরিচয়বাহী ইঙ্গিতময় কথাকাব্য। হিন্দু পুরাণ মতে ওঙ্কার হচ্ছে আদি ধ্বনি, সকল ধ্বনির উৎপত্তি এ ধ্বনি থেকে। লেখক বলতে চেয়েছেন, বাহ্য কান দিয়ে আমরা ধরতে পারি না পারি, সকল চেতনে, সকল হৃদয়ে সেই আদ্য ধ্বনি বিরাজিত। এ ধ্বনি এ হৃদয় এ চেতনা বোবা মেয়েতে ছিল, সে তাঁর প্রাণ দিয়ে তা প্রমাণ করেছে। একটি সমুচ্চ বক্তব্যকে তীক্ষ্ণ ও তীব্রভাবে প্রকাশের চেষ্টা করেছেন লেখক।[১৬] আবু নসর মোক্তারের বাক্‌শক্তিহীন মেয়েটি যেন **১৯৫৮**-তে আইয়ুবের সামরিক শাসনে থমকে পড়া বাঙালি জীবন। রাজনৈতিক দলগুলোর কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ, এমনকি ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অপহরণ এবং সংবাদ মাধ্যমগুলোকে কঠোর সেন্সরশীপের আওতায় আনা হলে পূর্ব বাংলার স্বাধিকারকামী বাঙালি জনমানস যে বৃত্তে আটকা পড়েছিল গণঅভুত্থানের বহুমাত্রিকতা দেশ-জাতিকে সেই সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক বেড়াজাল থেকে মুক্ত করে। দীর্ঘকালীন নিঃসাড়, নির্বাক, নির্জীবদশা থেকে বাঙালি তাজা প্রাণের বিনিময়ে, রক্তের বিনিময়ে মুক্ত প্রাণের স্বাদ লাভে সমর্থ হয়। আহমদ ছফার সেই বোবা মেয়েটি নিজেকে রক্তাক্ত করে তার বহু কাঙ্ক্ষিত বাক্‌শক্তি প্রাপ্ত হয়। উপন্যাসে মিছিলের তীব্রতা আর বোবা মেয়ের আত্ম চেষ্টা সমান্তরালে বর্ণিত হয়েছে। 'বিষয় গৌরবে বিশিষ্ট আহমদ ছফার *ওঙ্কার* একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। '৬৯-এর গণঅভুত্থানের সময় নিপীড়িত বাঙালির জীবনাবেগের প্রেক্ষাপটে রচিত এ উপন্যাসের শব্দ-স্রোতে প্রতীকী ব্যঞ্জনায় বোবা নায়িকা যেন হয়ে উঠে কণ্ঠরুদ্ধ শৃঙ্খলিত বাংলাদেশ।'[১৭]

একদল কৌশলী মানুষ নতুন করে অর্থসম্পদের মালিক বনে যেতে থাকে যেমনটা হয়েছে আবু নসর মোক্তারের বেলায়। শেষ পর্যন্ত এ কথক-পিতা সহায়সম্বল মোক্তারের কাছেই হারায় বা বিক্রি করতে বাধ্য হয়। *ওঙ্কার* এর আত্ম সুবিধাবাদী বিএ পাশ নায়ক ব্যক্তিগত লাভালাভের হিসেব কষে মোক্তারের বোবা কন্যাকে বিয়ে করে সৌভাগ্যের দর্শন লাভ করে। তার চরিত্রের এ দুর্বলতা মধ্যবিত্তের নতজানু-পরমুখাপেক্ষী মানসিকতার পরিচয় প্রকাশ করে। আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্রী আর ডিলার-এজেন্টের কোনো একটির সুবিধাভোগ করে শ্বশুর সাহেব আইয়ুবের দালাল বনে বিত্ত লাভ করে। সেই সঙ্গে ঘুষ তদবিরে পারদর্শী হয়ে সে বোবা মেয়ের জামাইয়ের সুখবৃদ্ধিতে প্রত্যক্ষ সহায়তা করে। এ ক্ষত-জর্জর সময়ে এ উপন্যাসের নায়কের মানসিকতার বিকাশ হলেও তার মনোভঙ্গি নিঃসন্দেহে সময়ের প্রেক্ষিতে যথার্থ নয়। তার ভাষায় 'এমন নিষ্ক্রিয় পুরুষ মানুষ' সে। তবে তার আত্মনিষ্ক্রিয়তা বাঙালির সে সময়ের চিত্র নয়। বরং তার বোবা স্ত্রীর হারমোনিয়ামের রীড টেপার সঙ্গে গলা দিয়ে বের হওয়া গোঙানি, যাকে বলা যায় দীর্ঘদিনের দুঃশাসনে গণমানসে পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ।

১৯৬৮ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়েরের প্রেক্ষিতে পূর্ববাংলার আপামর জনসাধারণ পাকিস্তানি শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার, সরব হয়ে উঠে। বলা যেতে পারে, বাঙালির আত্মজাগরণের স্ফূরণে আন্দোলিত হয় গোটা দেশ-জাতি। অধিকার-সচেতন বাঙালি রাজপথে নেমে আসে—ধারণ করে রুদ্র-মূর্তি। লাঠি-গুলো-টিয়ারগ্যাসকে উপেক্ষা করে শ্লোগানে শ্লোগানে মাতোয়ারা হয় বীর বাঙালি। মিছিলে পুলিশের গুলোতে আন্দোলনকারীদের কয়েকজন নিহত হলে কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র-শিক্ষক-বুদ্ধিজীবী হরতাল-ধর্মঘট কর্মসূচি পালন করে নিজেদের অবস্থান ব্যক্ত করে। আহমদ ছফার কাব্যিক বর্ণনায়:

> সারাদেশে শ্লোগানের ঢল নেমেছে। পথে ঘাটে মানুষ কেবল মানুষ। চন্দ্রকোটালের জোয়ারের জলের মতো বইছে মানুষ। বাংলাদেশের রাস্তাগুলো নদী হয়ে গেছে। তাদের চোখে আগুন, বুকে জ্বালা, কণ্ঠে আওয়াজ, হাতে লাঠি। রৌদ্রোজ্জ্বল দুপুরে শ্লোগানের ধ্বনি বাংলাদেশের আকাশমণ্ডলের কোটি কোটি বর্শাফলার মতো ঝিকিমিকি খেলা করে।[১৮]

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়েরের প্রেক্ষিতে শেখ মুজিবুর রহমানকে জেলে পাঠিয়ে শাসকগোষ্ঠী বিচার-প্রহসন চালায়। কিন্তু পূর্ববাংলার সংগ্রামী জনতা মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবসহ অন্যান্য রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে মিটিং-মিছিল অব্যাহত রাখে। উত্তেজিত জনতা সরকারি মদদপুষ্ট পত্রিকাগুলোর অফিস পুড়িয়ে দেয়। এ মুহূর্তে শ্বশুর এবং আইয়ুব খানের জন্য চিন্তিত হয় উপন্যাসের নায়ক। তার ধারণা 'মার্শাল যদি যান' তবে তার 'শ্বশুরও চিৎপটাং হবেন।' এ ধরনের চিন্তায় সে আত্মদগ্ধ হলেও এ ঘটনাগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে তার ব্যক্তিগত অসুবিধার চিন্তায় চিন্তিত হয়ে চূড়ান্ত সুবিধাভোগী মধ্যবিত্ত মানসিকতার পরিচয় দেয়। কেননা শ্রেণীবিভক্ত সমাজে যতক্ষণ পূর্ণভাঙন বা বিপ্লব কার্যকর না হয় ততক্ষণ মধ্যবিত্ত আত্মসুখসন্ধানে ব্যাপৃত রাখে। এ উপন্যাসের নায়কও তাই এর ব্যতিক্রম নয়। এ রকম গণজাগরণের মধ্যেও সে নিজেকে গুটিয়ে রাখে। আইয়ুব বিরোধী পোস্টার, দেওয়াল লিখন তাকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে রাখে। এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, সমাজ-রাষ্ট্রের এ উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সে পত্রিকার পাতায় দেশের খবর না পড়ে যৌন রোগের বিজ্ঞাপনে চোখ বুলায়। এ যে প্রাত্যহিক ঘটনা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখে অবদমিত মানসিকতার দ্বন্দ্বে আক্রান্ত হয়। '৬৯-র গণআন্দোলনে মুখরিত পরিস্থিতিতে ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ রেখে বাইরের পরিবেশ থেকে নিজেকে বিযুক্ত করে তৃপ্তিবোধ করে। কেননা:

> মিছিল আমি দুচোখে দেখতে পারি নে। শ্লোগানের আওয়াজ শুনলেই আমার কানে খিল ধরে। বোধশক্তি হারিয়ে ফেলি। মনে করতাম মিছিলকারীরা হাজার হাজার ধারালো বর্শা দিয়ে আমার সারা শরীর খোঁচাচ্ছে। তাই মিছিরের আনাগোনা দেখলেই দরোজা জানালা বন্ধ করা আমার একটা প্রিয় অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো।[১৯]

এরই মধ্যে আসাদের শহীদ হবার খবর আমরা উপন্যাসে পাই। আসাদের মৃত্যুতে বাঙালি রাজপথে পূর্ণউদ্যমে উজ্জীবিত হয়ে মিলিটারি-পুলিশের হুঙ্কারকে উপেক্ষা করে কর্মসূচি পালন করে। বাঙালির এ আত্মদানের মধ্য দিয়ে সামাজিক-রাষ্ট্রিক কাঠামোতে পরিবর্তন আসে। আর উপন্যাসের বোবা স্ত্রীর স্বরযন্ত্রে আসে শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন। যে কি-না আগে মিছিলের আওয়াজ কিংবা গানের রীডের সঙ্গে গোঙানির মত ধ্বনি উচ্চারণ করতো সে তখন 'বা... বা'-

র মতো আওয়াজ তোলে যেন ‘বাংলাদেশ’ শব্দটি ভেতর থেকে উগরে দিতে চায়। মনে হয় মানুষের নবজন্মের আকুতি মিছিলে আর স্বরতন্ত্রীতে অনুরণিত হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত বোবা বৌটির মুখের ‘বাঙলা’ অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে উচ্চারিত হয়। এ যে বোবা মেয়েটির মুখে কথা ফোটা, স্বরযন্ত্রের ক্রিয়াশীল হয়ে উঠা তা আসলে ’৬৯-র আন্দোলনে বাঙালির নবজাগরণেরই নামান্তর, নব উচ্চারণেরই নামান্তর। উপন্যাসের সমাপ্তি একটি প্রশ্নের মধ্য দিয়ে: ‘কোনো রক্ত বেশি লাল। শহীদ আসাদের—না আমার বোবা বৌয়ের?’ (*ওঙ্কার*, পৃ. ৪০)। এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা আমাদের চিন্তাকে তুলে ধরতে পারি। আমরা মনে করি, আন্দোলনের বীর শহীদের রক্ত এবং বাক্‌শক্তিপ্রাপ্ত মেয়েটির গলা দিয়ে বেরিয়ে আসা রক্তের পৃথক কোনো রূপ নেই। এ রক্ত বাঙালির প্রতিবাদের চিহ্ন, এ রক্ত আইয়ুব মোনায়েম শাহীর বিরুদ্ধে বিজয়ের নিশানা, এ লাল রং রক্ত রঙের বিচারে কখনই পৃথক নয়, বরং শোষণ-নিপীড়ণ-নির্যাতন-হত্যা-জুলুমের বিরুদ্ধে চেতনার স্মারক। উপন্যাসের সংযতবাক ঘটনা প্রবাহে দেশ বিভাগোত্তর কালের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের ক্রমরূপান্তর সূক্ষ্ম টানে অভিভূত হয়েছে। ‘[…] উপন্যাসের ঘটনাধারাকে যে অন্তঃপ্রবাহী প্রক্রিয়ায় নিদৃঢ় বক্তব্য অভিমুখী করে উপস্থাপন করা হয়েছে, তা রূপকীয় শিল্পবৈশিষ্ট্যে অভিষিক্ত।’[২০] সমালোচকের এ বক্তব্যের সঙ্গে সংহতি রেখে আমরা বলতে পারি মুক্তিযুদ্ধ-পূর্ব প্রেক্ষাপটের সার্বিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রেক্ষিতকে একটি বোবা মেয়ের শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তনকে প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করে ঔপন্যাসিক সমাজ সচেতনতা, রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা এবং ইতিহাস মনস্কতার যে পরিচয় দিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে উচ্চমানের ঔপন্যাসিক মানসিকতার পরিচয়বাহী।

দেশবিভাগ পরবর্তী বাংলাদেশের সাহিত্যের একটি বিশেষ দিক হলো রাজনীতি সচেতনতার বহিঃপ্রকাশ। এ সচেতনতার পেছনে ক্রিয়াশীল ছিল পূর্ববাংলায় পাকিস্তানি শাসন শোষণের লাগামহীন বৈষম্যের পরিপ্রেক্ষিতে নানাবিধ আন্দোলন সংগ্রাম। বলা যেতে পারে, এ-সময় বাংলাদেশের সাহিত্যে গণমুখী ধারার চর্চার বিষয়টি প্রাধান্য পায়। এ-ধারার অন্যতম কথাশিল্পী আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-১৯৯৭)। তাঁর প্রথম উপন্যাস *চিলেকোঠার সেপাই* (১৯৮৬) বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের উজ্জ্বলতম সময় ষাটের দশকের প্রেক্ষাপটে লেখা। তাঁর অপর উপন্যাস *খোয়াবনামা* (১৯৯৬) সময়ের দিক থেকে আরেকটু পিছিয়ে ’৪৭-র দেশবিভাগের প্রেক্ষাপটে লেখা। প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কর্মী ইলিয়াস না হলেও তাঁর মননে যে রাজনৈতিক বোধ ক্রিয়াশীল ছিল এর প্রমাণ আমরা তাঁর সাহিত্যকৃতিতে পেয়ে থাকি।

নির্বিচারে মানুষ হত্যা ছিল পাকিস্তানি পুলিশ বাহিনী তথা পাকিস্তানি শোষকগোষ্ঠীর নৈমিত্তিক ঘটনা। যেকোনো অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে পুলিশ তথা আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর অনুদার আচরণ কিংবা মারমুখী অবস্থান দেখা যেতো। যার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটায় ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে। পাকরাষ্ট্র নায়কের ‘মানুষ নয়, জায়গা চাই’ ধরনের ঘোষণা থেকে এ মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। মিছিলে পুলিশের গুলো ছিল খুবই সাধারণ ঘটনা। পুলিশের গুলোতে ছাত্র হত্যার ঘটনায় বর্ণনা পাওয়া যায় ঔপন্যাসের বয়ানে: ‘ইনভারসিটির যে ছেলেটি আজ পুলিশের গুলোতে মারা গেছে খিজির তাকে দ্যাখে নি। পুলিশের দিকে ইট-পাটকেল ছোঁড়ার তাগিদে যদি মেডিক্যাল

কলেজে ঢুকে না পড়ে তাহলে ঐ সময়টা সে থাকে ঢাকা হল ও পিজির মাঝামাঝি। ছেলেটা গুলোবিদ্ধ হয় ওখানেই।’ খিজিরের চোখে ইলিয়াস আমাদের দেখিয়েছেন মানুষ হত্যার রকমফের। *চিলেকোঠার সেপাই* উপন্যাসের শুরুতেই আবু তালেবের পুলিশের গুলোতে শহীদ হওয়ার খবর আমরা পাই। শহীদ আবু তালেব যে কি-না ইপিআরটিসির কর্মচারি এবং পরিবারের উপার্জনক্ষম একমাত্র ব্যক্তি। শহীদ আবু তালেবের লাশ নিয়ে সরকারপন্থী ও বিরোধীদের মধ্যে বাঁধে গণ্ডগোল। পুরোনো ঢাকার গলিতে গলিতে শ্লোগান উঠে ‘শহীদের রক্ত—বৃথা যেতে দেবো না, আইয়ুব শাহী জুলুম শাহী—ধ্বংস হোক ধ্বংস হোক।’ মানুষ হত্যার প্রতিবাদে পালিত হয় হরতাল ধর্মঘট। দেশব্যাপী এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। জামালপুরের প্রসঙ্গ এনে এর ভিত্তিকে দৃঢ় করা হয়েছে। আনোয়ারের জবানিতে এ সময়ের আন্দোলনের মাত্রিকতা সহজেই ধরা পড়ে:

> এর আগে পিপল যেসব মুভমেন্টে এ্যাকটিভাল পার্টিসিপেট করেছে সেগুলো হয়েছে এক একটি এলাকা জুড়ে। ধরো তেভাগা, ধরো হাজং কিংবা সাঁওতালদের বিদ্রোহ এগুলো বিশেষ বিশেষ এলাকায় সীমাবদ্ধ ছিলো, তাই না?[২১]

আন্দোলন সারাদেশে এবং সকল শ্রেণীপেশার সচেতন মানুষকে আলোড়িত করেছিল। এ উপন্যাসে বাংলাদেশের রাজধানী শহর ঢাকাকেন্দ্রিক অবস্থা এবং বগুড়া জেলার চরাঞ্চলের সমাজ-রাজনৈতিক অবস্থাকে পাশাপাশি তুলে ধরেছেন ইলিয়াস। নগর ঢাকার মানুষের আন্দোলন বিষয়ক চিন্তা ও ধারণা যেমন এখানে মূর্ত তেমনি গ্রামাঞ্চলের মানুষের এ বিষয়ক ধারণা ও পদক্ষেপ মূর্ত হয়ে উঠেছে। ’৬৯-র গণআন্দোলন ছিল মুক্তিযুদ্ধ পূর্ববর্তী গণমানুষের অংশগ্রহণে সংগঠিত কোনো সংগ্রাম। সেই আন্দোলনের গণজোয়ারে সমাজের নিচুবর্গের মানুষের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ পাকিস্তানি গোষ্ঠীর ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিল। এতকাল ধরে যে মধ্যবিত্ত শুধু ব্যক্তিগত সুখসন্ধানে ব্যাপৃত ছিল এখানে *চিলেকোঠার সেপাই*-র মধ্যবিত্তরা অধিকার আদায়ের আন্দোলনে নেমেছে। যেমনটা বলেছিলেন কার্ল মার্কস—দেয়ালে পিঠ না ঠেকা পর্যন্ত মধ্যবিত্ত সোজা হয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করে না। এ আন্দোলনে যেমন দুই পৃথক শ্রেণী ছিল তেমনি উপন্যাসের চরিত্রের মধ্যেও স্পষ্ট বিভাজন রেখা বিদ্যমান। একদিকে আন্দোলনকারী ওসমান, খিজির, আলতাফ, আলাউদ্দিন, আনোয়ার, চেংটু, আলিবক্স অন্যদিকে পাকিস্তানপন্থী রহমতউল্লা, খয়বার গাজী, হোসেন আলী, আফসার গাজী প্রমুখ। উপন্যাসের শুরুতে ওসমানকে আমরা যে দশায় পাই শেষ পর্যন্ত ওসমান তা থাকে নি। মধ্যবিত্ত মানসিকতার ওসমানের যে বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবর্তন তা আসলে বাঙালি জাতিসত্তার সম্মুখগামী পরিবর্তন বলেই গণ্য। এ আন্দোলনে শহীদ হয় উপন্যাসের চরিত্র হাড্ডি খিজির। খিজিরের এ আত্মত্যাগ নিচুবর্গের মানুষদের দেশমাতৃকার প্রতি সেই শ্রেণীর মানসিক অন্তরঙ্গতাকে প্রতীকায়িত করেছে।

বাংলাদেশের সাধারণ গ্রামজীবনের প্রতিনিধিত্বমূলক চিত্র হিসেবে উপন্যাসের গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে রচিত অংশে আমরা দেখি বগুড়া জেলার চরাঞ্চলে খয়বার গাজীর নির্মম শোষণ। তারই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায় কৃষকদের গরু চুরি করে হোসেন আলী ফকিরের তত্ত্বাবধানে এক দুর্গম চরে

রাখা হয়। এ ঘটনার সঙ্গে যোগসূত্র হিসেবে উপন্যাসে এসেছে আনোয়ার। বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মী আনোয়ার পারিবারিক সূত্রে সম্পর্কযুক্ত। গ্রামে গিয়ে আনোয়ার চরম প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে নিপতিত হয়। একদিকে আত্মীয়-স্বজন, অন্যদিকে রাজনৈতিক কমিটমেন্ট—তাকে বিভ্রান্ত করেছে। সেখানে তার আত্মীয় মধ্যবিত্তের প্রতিনিধি শ্রমশোষক, গ্রাম্য মাতবর খয়বার গাজী, আফসার গাজী গরুচুরি থেকে শুরু করে নানাবিধ সামাজিক অপকর্মের সঙ্গে জড়িত। মধ্যবিত্তসুলভ মানসিকতা, রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা, পার্টির হাইকমান্ডের নিস্পৃহতা এবং আত্মীয়তার বেড়াজালের খোলস ছেড়ে মুক্ত হতে পারে নি আনোয়ার। ব্যক্তিচরিত্রের এবং রাজনৈতিক চরিত্রের সমন্বয়হীনতা তার স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডকে ব্যাহত করে। এ সকল সামাজিক-রাজনৈতিক অনুষঙ্গের দোলাচালে শিক্ষিত কলেজ শিক্ষক, বামরাজনৈতিক কর্মী আনোয়ারের জীবনের টানাপড়েন। আনোয়ার তাই প্রগতিশীল প্রতিবাদী চরিত্র হওয়া সত্ত্বেও আনোয়ার মনোযোগ আকর্ষণে ব্যর্থ হয়। চরাঞ্চলের সামাজিক অপকর্ম রোধে আনোয়ারকে যেতে হয় বগুড়ার চরাঞ্চলে—তার পিতৃভূমিতে। আনোয়ার গ্রামে যায় কিন্তু কিভাবে কোনো পরিকল্পনা অনুয়ায়ী যায় তা অনুক্ত থেকে যায়। তার দিক্‌নির্দেশনাহীন কর্মকাণ্ড এবং দৃঢ় রাজনৈতিক ভিত্তির অভাবে মনে হয় সে একা বিচ্ছিন্নভাবে এ কাজে ব্রতী হয়েছে। একারণেই আনোয়ার উপন্যাসে ঠিকভাবে দাঁড়াতে পারে না। তার অবস্থানও ঘোলাটে।[২২] অথচ '৬৯-র গণঅভ্যুত্থানে বামরাজনৈতিক কর্মীদের বলিষ্ঠ ভূমিকা সর্বজনগ্রাহ্য। এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে, আনোয়ারের এহেন পরিণতির পেছনে রয়েছে ব্যক্তিচরিত্রের দুর্বলতা, রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাব এবং পারিবারিক ও মধ্যবিত্তসুলভ মানসিকতার অভিক্ষেপ।

নির্যাতিত মানুষের পিঠ যখন দেয়ালে ঠেকে যায় তখন প্রতিবাদ-প্রতিরোধ অনিবার্য। তাই উপন্যাসে দেখি বিপ্লবী কর্মী আলিবক্স ও নিচুবর্গের প্রতিনিধি চেংটুর নেতৃত্ব ও নির্দেশনায় গ্রামবাসী চুরি করে রাখা চরের গরুর আস্তানায় হামলা চালায়। পাশাপাশি বৈরাগীর ভিটায় গণশত্রু খতমের নামে বসে গণআদালত। খয়বার গাজীর বিচারের আয়োজন হয় সেখানে। কিন্তু ছয়দফাপন্থী আওয়ামী কর্মীদের মিছিল এসে গণআদালতের কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত করে। এক্ষেত্রে নকশাল আন্দোলনের শ্রেণীশত্রু খতমের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। অভ্যন্তরীণ কোন্দলে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় চেংটুকে। যে আনোয়ার ঢাকার রাজপথে ক্রিয়াশীল ছিল সেই আনোয়ার তার নিজ গ্রামে নিশ্চুপ হয়ে পড়ে। কেননা শ্রেণীশত্রু খতম আর গণআদালতের কোনোটাই পরিণতি পেতে পারে না, তার আগেই আন্দোলন বেপথু হয়। আন্দোলনের নেতৃত্বে পালাবদল ঘটে। একই সময়ে পশ্চিমবঙ্গের নকশালবাড়িকে কেন্দ্র করে যে কৃষক বিদ্রোহের জন্ম হয় তাও অতি বিপ্লবী ভাবধারা এবং শ্রেণীশত্রু খতমের নামে লুণ্ঠন, হত্যা আর রাহাজানিতে পরিণত হলে রাজ্যসরকার বিপ্লবী দলগুলোকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এ ঘটনার উৎস ও পরিণতির সম্যকচিত্র সমরেশ মজুমদারের *কালবেলা* উপন্যাস। অর্থাৎ আন্দোলনের নেতৃত্ব পরিবর্তন হলে এর পরিণতি কখনই কাঙ্ক্ষিত পথে এগোয় না। এ উপন্যাসে চরিত্র এসেছে ঘটনার পরম্পরায়। বিশেষভাবে ওসমান, আনোয়ার, খিজির, চেংটু, আলিবক্সকে আমরা দেখতে পেলেও উপন্যাসের চালিকাশক্তিরূপে সময়ই নায়ক হয়ে উঠেছে। প্রাসঙ্গিকভাবে চরিত্র হিসেবে উঠে এসেছে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ।

রাজনৈতিক ঘটনার প্রত্যক্ষ উল্লেখ এ উপন্যাসকে ইলিয়াস কাহিনী বিন্যাসে ঐতিহাসিক ঘটনাকে যেভাবে উপন্যাসে উপস্থাপন করেছেন মনে হয় উপন্যাসের চরিত্রগুলো সত্যিকারই ঘটনার অংশগ্রহণকারী। ইলিয়াসের মুন্সিয়ানা এবং *চিলেকোঠার সেপাই* এর বিশেষত্ব সম্পর্কে সমালোচকের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

> ইতিহাসের প্রতি দায়বদ্ধতা এবং ফর্ম সতর্কতার সমন্বয়ে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বাংলাদেশের উপন্যাসের এপিক ধারায় তৃতীয় শিল্পী। সংশপ্তক থেকে যে ইতিহাসধারার সূত্রপাত, আরেক ফাগুন এ সেই ঐতিহাসিক সম্ভাবনার প্রতীকী উন্মোচন এবং চিলেকোঠার সেপাইতে মুক্তিযুদ্ধের পূর্ব দিগন্ত রেখা স্পর্শ করে সেই ধারার সমাপ্তি।[২৩]

চিলেকোঠার সেপাই উপন্যাসে গ্রামও ও শহর দু'টি ভাগে চরিত্রের আগমন ঘটেছে অগণিত। তবে এসব চরিত্রের মধ্যে বিকাশ ও পরিণতি প্রাপ্ত চরিত্রের সংখ্যা নগণ্য। কেননা নিম্নবর্গের চরিত্রসমূহ কিছুটা দৃঢ়তার পরিচয় বা নৈতিকতার ধার ধারলেও মধ্যবিত্ত সমাজভূক্তরা একেবারেই আত্মস্বার্থপরতায় মগ্ন থেকেছে। তাই যে রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এ উপন্যাসের কাহিনীর পল্লবায়ন তাতে দু'চারটা বিপ্লবী তথা দৃঢ়কামী মানসিকতার চরিত্র উপস্থিত থাকার কথা ছিল। উপন্যাসে সংগ্রামী চেতনার প্রকাশ ঘটাতে পারত ওসমান, পারে নি। দায়িত্ব নিতে পারত আনোয়ার, মধ্যবিত্তসুলভ আপোষকামী মানসিকতার জন্য তা হয়ে ওঠে নি, সেই মহান দায়িত্ব পালন করেছে দু'জন—একজন চেংটু, অন্যজন হাড্‌ডি খিজির। দেশ ও জনগণের মুক্তি ও কল্যাণের জন্য দু'জনেই গ্রাম্য মাতবর কিংবা মহাজনদের হাতে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। খিজিরের অবর্তমানে ঢাকা শহরের প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পড়ে জুম্মনের হাতে। কারণ ওসমান হয়ে যায় মানসিকভাবে বিকারগ্রস্থ। আনোয়ার ব্যক্তিজীবনে ও রাজনৈতিকজীবনে ব্যর্থ, আলাউদ্দিন নিপতিত হয় মহাজন রহমতউল্লার রক্ষাকারী হিসেবে। অনাগত ভবিষ্যতের সুখ-স্বপ্ন রচনার দায়িত্ব পড়ে জুম্মনের উপরে। মুতুর পূর্বে খিজির জুম্মনকে দিয়ে যায় একটি প্লায়ার, একটি স্ক্রু ড্রাইভার আর একটি সাইকেলের চকচকে চেইন। ওদিকে বগুড়ার চরাঞ্চলে খয়বার গাজী, আফসার গাজীদের নির্মমতার শিকার চেংটু তথা প্রতিবাদী জনতা। গরু চোরের উপদ্রব থেকে সহায় সম্বলহীন গ্রাম্যচাষীদের রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়ে গ্রাম থেকে ঢাকায় ফিরে আসে আনোয়ার। ঐ চরাঞ্চলের চাষাদের রক্ষা করার জন্য রয়ে যায় বাম রাজনৈতিক কর্মী শিক্ষিত আলিবক্স। আলিবক্সের দায়িত্ব—চাষী ও সর্বহারাশ্রেণীর পক্ষ নিয়ে জুলুমবাজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার। কিন্তু একথা সত্য যে, 'উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের মধ্যে শুধু আনোয়ারের মত কর্মীই ছিল না, কিংবা ওসমানের মত আন্তরিক অথচ আত্মকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত দরদীই ছিল না, সব পিছুটান অগ্রাহ্য করবার মত কর্মীও ছিল। তেমন কর্মীদের জন্যই গণআন্দোলন এতটা অগ্রসর হতে পেরেছিল। কিন্তু তেমন কোনো কর্মী শক্তভাবে এ উপন্যাসে দাঁড়ায় নি। আলীবক্সের মধ্য দিয়ে তার আংশিক রূপায়ণ আমরা দেখি। কিন্তু এ চরিত্র পাশে থাকে, সামনে আসে না।'[২৪] তাই আলিবক্সকে পূর্ণ রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে চিহ্নিত করা গেলেও নেতৃত্বের বিকাশমান প্রতিচ্ছবি ওর মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠে না। যে আনোয়ার কথার তুবড়িতে দেশ উদ্ধার করতো বামপন্থী চেতনায়, যে খিজির তার

প্লায়ার আর স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে স্বপ্ন দেখতো মহাজনদের দিন শেষের কিংবা যে চেংটু ব্যক্তিগত লাভালাভের ধার কখনোই ধারতো না, তাদের কেউই টিকে থাকতে পারে নি নব্য-পুঁজিপতি মহাজন-মাতবরদের হিংস্র থাবায়।

বাঙালি জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সময় মুক্তিযুদ্ধ-পূর্ব সময়কার সংগ্রামমুখর জীবনের বর্ণনায় ইলিয়াসের *চিলেকোঠার সেপাই* উপন্যাসটির আবর্তন। মৃত্যু এবং মৃত্যুখচিত রক্তাক্ত প্রতিবাদ ও আর্তনাদের যে-চিত্র আমরা *চিলেকোঠার সেপাই*-এ লক্ষ করি সে-চিত্র সমকালীন অথবা পূর্ববর্তী বাংলা উপন্যাসে দেখা যায় না। এখানেই এ উপন্যাসের বিশেষত্ব। আন্দোলন-বিদ্রোহে উদ্বেল যে ঘোর আবহাওয়ায় উপন্যাসটি শুরু হয়েছিল শেষদিকে ক্রমশ তা ঝিমিয়ে পড়ে। ঝিমিয়ে পড়ার পেছনে কতিপয় জনগোষ্ঠীর নৈতিক চরিত্রের স্খলনই দায়ী। এজন্য ঢালাও ভাবে বাঙালিদের দায়ী করা না গেলেও আপাতদৃষ্টিতে দায়ী আমরাই। তাই পাকিস্তানি স্বৈরশাসনমুক্ত হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের ফলে আন্দোলনের যে সাফল্য অর্জিত হয় তা আংশিক, পুরোপুরি নয়। দেশের সমাজ কাঠামোর এবং শাসকশ্রেণীর রাজনৈতিক চরিত্রের মৌলিক কোনো পরিবর্তন হয় না। এ-কারণেই বাংলাদেশের মানুষ যে সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ৬-এর দশকে মিছিলে মিছিলে ঢাকার পথপ্রান্তর কাঁপিয়ে দিয়েছিল তাদের অবস্থার কোনো হেরফের হয় নি পরবর্তী সময়ের—স্বাধীন বাংলাদেশে। এ সমস্ত যৌক্তিকতার পরিপ্রেক্ষিতে এ কথা বলা যায় যে, '*চিলেকোঠার সেপাই* শুধু বাংলাদেশের নয়, সমগ্র ভারত উপমহাদেশের জনগণের মুক্তিআন্দোলনের ব্যর্থতা ও হতাশার দলিলে পরিণত হয়েছে।'[২৫] এ ব্যর্থতা ও পরাজয়ের জন্য ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব ও সুবিধাবাদী মানসিকতাই দায়ী।

ধর্মকেন্দ্রিক দেশবিভাগের প্রেক্ষাপটে মুসলিম লীগ ছিল উচ্চকণ্ঠ। জাতিগত এ বিভক্তি যে কত দুঃখময় ইতিহাসের জন্ম দিতে পারে তার প্রমাণ তেইশ বছরের পাকিস্তানি দুঃশাসন। মুসলিমলীগ নিজেদের অবস্থান ধরে রাখার জন্য সকল কিছুতেই ধর্মীয় ইস্যু জড়িয়ে ফেলতো। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মুসলিমলীগপন্থী অতি-প্রবণরা মানুষকে নির্যাতন করতো। মনে করা হতো, 'মুসলিমলীগের এগেনেস্টে কথা বললে যখন গুণা হইত, বুঝলেন গুণা হইতো, জমাতে নামাজ কি পড়বার দিতো না।' '৬৯-র আন্দোলনের চূড়ান্ত সফলতা অর্জনের বড় অন্তরায় একই আন্দোলনে দুই স্রোত। দুই মতের আদর্শগত পার্থক্য দেখা যায় একই সমাবেশে শ্লোগানের মধ্য দিয়ে। সমাবেশে বক্তৃতা শেষ হওয়ার আগেই দক্ষিণ দিকের গেটের পামগাছের নিচে জটলা থেকে শ্লোগান ওঠে—'সাম্রাজ্যবাদের দালালেরা হুশিয়ার সাবধান! দুনিয়ার মজদুর এক হও, জোতদারের গদিতে আগুন জ্বালো একসাথে, মিল মালিকের গতিতে আগুন জ্বালো একসাথে।' আবার এ শ্লোগান চলছে, তো তখন বেদীর নিচের সেই জটলা থেকে দক্ষিণ দিকে মুখ করে কয়েকজন শ্লোগান দেয়: 'বাঙলার মজদুর—এক হও, ছয় দফা ছয় দফা—মানতে হবে, মানতে হবে, আগরতলা ষড়যন্ত্র—মানি না, মানি না, শেখ মুজিবের শেখ মুজিবের—মুক্তি চাই মুক্তি চাই।'[৬] এ যে দেশ কিংবা নেতার প্রশ্নে সমাবেশে ভিন্ন ভিন্ন সুর তা-ও সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত

করেছে। যেখানে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন সেখানে এ ধরনের হীন-মানসিকতার আচরণ আপামর জনতাকে দ্বিধাবিভক্ত করেছে।

সমসাময়িক ঘটনার প্রত্যক্ষ উল্লেখ চিলেকোঠার সেপাই উপন্যাসের প্রামাণ্যতা বৃদ্ধি করেছে। এক্ষেত্রে এ উপন্যাসটি পরিণত হয়েছে ঐতিহাসিক দলিলে। ১৯৬৯-র গণঅভ্যুত্থানের সময় ১৯ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পাকিস্তানি আর্মি-পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. শামসুজ্জোহাকে দিনে-দুপুরে হত্যা করে। এ হত্যাকাণ্ডের উল্লেখ দেখা যায় উপন্যাসে: 'আরে রাজশাহীতে জোহা ভাইকে মেরে ফেলেছে। আর্মি নাকি বেয়নেট খুঁচিয়ে মেরেছে।' আন্দোলনের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান। ২০ জানুয়ারি ১৯৬৯ মিছিলে পুলিশের গুলোতে শহীদ হয় ছাত্রনেতা আসাদ। আসাদের মৃত্যু-প্রসঙ্গও উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। *চিলেকোঠার সেপাই* উপন্যাসের সূত্রপাতও একটি মৃত্যু-ঘটনার মধ্য দিয়ে। ১৯৬৯ সালের গড়ে ওঠা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী স্বল্প বেতনভোগী ঢাকার নীলক্ষেতের পাওয়ার স্টেশনের কেরানি আবু তালেবের পুলিশের গুলোতে নির্মমভাবে মৃত্যু-দৃশ্য অবতারণার সূত্র ধরেই উপন্যাসটিতে গণঅভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী চরিত্র ও ঘটনার অনুপ্রবেশ ঘটে। আবু তালেব—মকবুল হোসেনের পুত্র, রানু ও রঞ্জুর ভাই—এ পরিবারটি ভাড়া থাকে পুরনো ঢাকার এক বাড়ীতে, যে বাড়ীর মালিক রিকশার মহাজন রহমতউল্লা। এ বাড়ীরই চিলেকোঠায় ভাড়া থাকে ওসমান—মোহাম্মদ ওসমান গণি ওরফে রঞ্জু একজন ইপিআরটিসি-র সামান্য বেতনের কেরানি। এ চিলেকোঠায় বসে ওসমান চলমান সামাজিক, রাজনৈতিক জীবনের সকল ঘটনার সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করে কষ্ট পায়, তার ভেতরে ক্ষোভ, দুঃখ, অপ্রকাশিত প্রেম ভালোবাসা জমা হয়ে ব্যক্তিত্ব বিকাশে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। একসময় তা ব্যক্তিসর্বস্বতায় পরিণত হয়। একসময় ওসমান হয়ে যায় পাগল, সিজোফ্রেনিক রোগী। ওসমানের এরূপ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের নিজস্ব মতামত:

> ওসমান প্রথম থেকেই ঘোরতরভাবে নিজেকে নিয়ে মগ্ন। সংগ্রামে সে বার বার হেরে যায়। কারো সঙ্গে involved হওয়া তার সাধ্যের বাইরে। রানুর প্রেম তাকে একটু নাড়া দেয়, কিন্তু সেখানে সে সাড়া দিতে পারে না, বরং অসুস্থ হয়ে পড়ে। কিন্তু এর মধ্যেও নিজের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসার জন্য তার যুদ্ধ চলতেই থাকে। [...] দ্বন্দ্ব তার প্রথম থেকেই ছিলো, দিনে দিনে তার বিকাশ হয়েছে। উন্মাদ হওয়ার মধ্যে তার ভেতরকার ব্যক্তির বিনাশ ঘটে [...][২৬]

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের হলে আন্দোলনের মুখে প্রত্যাহারের প্রশ্নে ভিন্নধর্মী মতামত জনমানসে প্রতিফলিত হয়। কিন্তু বাঙালির নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে কোনো জেল-জুলুম-হুলিয়া আটকাতে না পারলেও কিছুসংখ্যক সুবিধাবাদী মানসিকতার বুদ্ধিজীবী ছড়াতে থাকে নানা অপপ্রচার। তাদের ভাষ্যমতে, 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করা আইয়ুব খানের পক্ষে অসম্ভব। সত্যি হোক মিথ্যা হোক, একবার মামলা যখন শুরু করেছে আর্মির সম্মান, এমনকি অস্তিত্ব নির্ভর করে এর ওপর।' এ-ধরনের বক্তব্য ও মতামত থেকে বোঝা যায় এরা কারা, কোথায় তাদের অবস্থান এবং তাদের মনোবাসনা কি। অন্যদিকে ছাত্ররাজনীতিকে অস্থির ও প্রশ্নবিদ্ধ করতে আইয়ুব খানের সমর্থনে মোনায়েম খান কর্তৃক এনএসএফ গঠিত হয়। এ সংগঠনের নেতারা ছিল সর্বগুণে গুনান্বিত। প্রকাশ্য হত্যা-সন্ত্রাস-

রাহাজানি-নির্যাতন সবকিছুতে তারা পটু। এ নেতাদের প্রভাব ছিল গভর্নর প্রাসাদ পর্যন্ত। যার কারণে এরা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শিক্ষক লাঞ্ছনার ঘটনা ঘটাতে দ্বিধাবোধ করে না। এনএসএফ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা ছিল সুস্পষ্ট, মানুষ জানতো—'আইয়ুব খানের বাস্টার্ড মোনেম খান, মোনেম খানের বাস্টার্ড এরা।'

চিলেকোঠার সেপাই পুরোপুরি রাজনৈতিক উপন্যাস, এ-কথা সত্য। এ-কথা প্রযোজ্য যেমন ঢাকার নাগরিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে, তেমনি উত্তর-বাঙলার গ্রামাঞ্চলের আন্দোলনের ক্ষেত্রে। এ দু-ক্ষেত্রেই যেসব চরিত্র ও ঘটনার বর্ণনা এখানে আছে তাদের প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্র এমনই যে, ইলিয়াসের এ কাহিনীকে তৎকালীন ইতিহাসের এমন এক কাহিনীচিত্র হিসেবেই দেখা যায় যাতে বড় বড় নেতা এবং উপনেতার প্রান্তিক ভূমিকা গৌরবান্বিত করার চেষ্টা নেই, ইতিহাসের প্রকৃত চালিকাশক্তি জনগণের বিভিন্ন অংশের নাগরিক ও গ্রামীণ জনগণের ভূমিকাই উপস্থিত করা হয়েছে। ঢাকা শহর বিশেষত পুরনো ঢাকা ছিলো ইলিয়াসের খুবই পরিচিত। এ পুরনো ঢাকার শ্রমজীবী, ছোটখাট মহাজন, ব্যবসায়ী, চাকুরীজীবী, বেকার, বস্তিবাসী প্রভৃতির জীবন ঊনসত্তরের আন্দোলনের সময় কিভাবে আলোড়িত হয়েছিল, কিভাবে তারা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন, বিভিন্ন ঘটনার প্রতিক্রিয়া তাদের মধ্যে কেমন ছিল, এসব সাহিত্যিকের দক্ষতা নিয়ে বর্ণনা করলেও তাঁর রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টি যে কাহিনী নির্মাণের ক্ষেত্রে মূল প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে সেটা যেকোনো perceptive পাঠকের কাছেই ধরা পড়বে।[২৭] এ-কারণেই বাংলাদেশের রাজনৈতিক উপন্যাসের ধারায় এটি অন্যতম সংযোজন বলে বিবেচিত।

পুরোনো ঢাকার রিকশা গ্যারেজ মালিক পাকিস্তানপন্থী রহমতউল্লার শোষণ আর অন্যায়-অপকর্মে অন্তর্দহিত হতে থাকে খিজির। এ মানসিক যাতনা থেকেই আইয়ুব-বিরোধী মিছিলের অগ্রভাগে দেখা যায় তাকে। মুখ থেকে প্রতিবাদের ভাষায় খিজির আগুন ঝরায়। খিজিরের এহেন প্রতিবাদে বিরক্ত হয়ে মহাজন তার পেছনে পোষাগুণ্ডা লেলিয়ে দেয়। মহাজনের পোষা মাস্তান বজলু ও তার সহযোগীদের আক্রমণে আহত হয় খিজির। মহাজন খিজিরকে বস্তি ছাড়ার নির্দেশ দেয়। অত্যাচারিত, নিপীড়িত, লাঞ্ছিত, আহত খিজির ক্ষণিকের তরে হলেও দোটানায় পড়ে যায়। কেননা একদিকে পুত্র জুম্মন অন্যদিকে তার স্ত্রী গর্ভে মহাজনের ব্যভিচারের ফসলের প্রতি পিতৃসুলভ মমতা তাকে বিভ্রান্ত করে তোলে। স্ত্রীর নির্দেশ অমান্য করলে বস্তির ঘর ছাড়া হতে হবে এ বিষয়টিও খিজির ভেবে দেখে। অন্যদিকে আন্দোলনকারী হিসেবে তার রয়েছে দেশ, জাতি ও সমাজের প্রতি কমিটমেন্ট— এ বহুবিধ ব্যক্তি-চরিত্রের টানাপড়েনে খিজির হয়ে ওঠে ঢাকা শহরের চরিত্রগুলোর মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত। খিজিরের রাজনৈতিক কোনো উদ্দেশ্য না থাকলেও দেশ-জাতির প্রতি তার আবেগ পাঠককে মোহিত করে। তবে ব্যক্তি খিজির যেহেতু মহাজন কর্তৃক শোষিত নির্যাতিত তাই তার শ্লোগানে মহাজন রহমতউল্লার বিরুদ্ধে ক্ষোভ-আক্রোশ প্রকাশ পায়:

> এরকম ২/৩ বার শ্লোগান দেওয়ার পর খিজিরের উচ্চকণ্ঠ শোনা যায়, 'আইয়ুবের দালাল মাহাজন!' কিন্তু এর কোনো জবাব পাওয়া যায় না। দ্বিগুণ শক্তিতে খিজির চিৎকার করে, 'আইয়ুবের দালাল মাহাজন!' এবার জবাব আসে, 'ধ্বংস হোক, ধ্বংস হোক!' তারপর ফের শ্লোগান ওঠে, 'মাহাজনের জুলুম, মাহাজনের জুলুম'—'চলবে না, চলবে না!' খিজির এবার ফের নতুন শ্লোগান তোলে, 'মানুষরে ডাইকা বেইজ্জতি করা'—'চলবে না, চলবে না!'[২৮]

সাধারণ মানুষের জীবনের প্রতিটি বাঁক যে-ভাবে *চিলেকোঠার সেপাই*-এ বিশ্লেষিত হয়েছে তা একদিকে আমাদেরকে ব্যক্তির জীবনের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বোধ জাগায় এবং অন্যদিকে বাংলাদেশের রাজনীতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে উজ্জ্বলতম ঘটনা '৬৯-র গণঅভ্যুত্থানের রাজনৈতিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের মানুষের সার্বিক আকাঙ্ক্ষারই রূপায়ণ ঘটেছে এ উপন্যাসে। এ-ক্ষেত্রে বলা যায় যে, *চিলেকোঠার সেপাই* সমগ্রতাস্পর্শী বাংলা উপন্যাস। '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশের মানুষের জীবনে যে জোয়ারের সৃষ্টি করেছিল তার নিদর্শন হিসেবে *চিলেকোঠার সেপাই* উপন্যাস নন্দিত। এ-প্রসঙ্গে আনু মুহাম্মদের বিশ্লেষণ:

> [...] আখতারুজ্জামান ইলিয়াস আমাদের দেশের তেমন একজন শিল্পী, যিনি কলম শুধু নয় প্রখর ক্ষমতা, মমতা এবং দায়িত্বপূর্ণ দৃষ্টির আঁচড় দিয়ে এ সময়কে আবারো আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করেছেন। আমরা তাঁর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে জীবন্ত দেখি সেই সময়কে যে সময় আমাদের মরা গাঙে জোয়ার সৃষ্টির উদ্যোগ নেয়। 'চিলেকোঠার সেপাই' নামের উপন্যাস ইলিয়াস তৈরি করেন জীবনকে এবং উপন্যাসকে তার যথার্থ স্থান দেখিয়ে দেবার জন্য।[২৯]

রাজনীতিই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার চালিকা শক্তি। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী রাজনীতিকে কলুষিত করে কুক্ষিগত করে রেখেছিলো বাংলাদেশের অধিকার। কিন্তু অধিকার আদায়ে বাঙালির সমবেত প্রয়াস বিষয়ে তারা ছিলো অজ্ঞ। কেনান বাঙালি জাতির পরবর্তী ইতিহাস এ-কথাই সাক্ষী দেয়। সমাজ সচেতন ধারার কথাশিল্পী আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বাঙালির এ জাগরণকাল আর মানসিকতার চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন *চিলেকোঠার সেপাই* উপন্যাসের অবয়বে।

জহিরুল ইসলামের *অগ্নিসাক্ষী* ষাটের দশকের রাজনৈতিক ঘটনাবলির প্রামাণ্য বিবরণমূলক উপন্যাস। একটি মধ্যবিত্ত পরিবারকে কেন্দ্র করে জাতীয় ঘটনাবলিকে রূপায়িত করেছেন ঔপন্যাসিক। *অগ্নিসাক্ষী* তাই বাঙালির জাগরণের প্রত্যক্ষ দলিল বলেই রাজনীতি সচেতন মহলে বিবেচিত। আইয়ুবি দুঃশাসনে বাঙালি মানসের যে জারণ প্রক্রিয়া চলছিল তারই বিজারণ প্রতিক্রিয়ার প্রতীক-চিত্রসম্বলিত উপন্যাস আহমদ ছফার *ওঙ্কার*। দেশ-কাল প্রেক্ষাপটের সাথে একটি বোবা মেয়ের বাক্শক্তি প্রাপ্তির ঘটনা বাঙালি জাতির জাগরণের বিষয়কেই মূর্ত করে তোলে। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের *চিলেকোঠার সেপাই*-এর পটভূমি '৬৯-র গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে সামাজিক-রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ। গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা ও বগুড়া জেলার চরাঞ্চলের ঘটনাপ্রবাহ একসূত্রে গ্রন্থিত। গণআন্দোলনের প্রেক্ষাপটে সকল শ্রেণী-পেশার মানুষের অংশগ্রহণে বাঙালির স্বাধীনতাপূর্ব সময়কাল মূর্ত হয়ে উঠেছে। ইলিয়াস শ্রেণীচেতনার দর্পণে রাজনৈতিক বাস্তবতার ভেতরের স্পন্দনকে প্রতিফলিত করেছেন। ইলিয়াস দেখিয়েছেন সংগঠিত বিপ্লবী নেতৃত্বের অভাবে আন্দোলন স্বাভাবিক পরিণতিতে পৌঁছায় নি। *চিলেকোঠার সেপাই* বাঙালির দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ সময়ের পূর্ণায়তন বৃত্তান্ত।

তথ্যনির্দেশিকা

১. হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ: দলিলপত্র*, ২য় খণ্ড, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ৩৬৭-৩৬৯
২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০৫-৪০৮
৩. লেনিন আজাদ, *উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান: রাষ্ট্র, সমাজ ও রাজনীতি*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৫৬১-৫৬৭
৪. মোহাম্মদ হাননান, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ১৫৬-১৬১।
৫. হাসান হাফিজুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৫-৪৩৮
৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪৬
৭. রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস: বিষয় ও শিল্পরূপ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ১৮৪।
৮. শহীদ ইকবাল, *রাজনৈতিক চেতনা: বাংলাদেশের উপন্যাস*, সাহিত্যিকা, ২০০৩, পৃ. ৯০
৯. জহিরুল ইসলাম, *অগ্নিসাক্ষী*, হরপ্পা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃ. চৌদ্দ
১০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ত্রিশ
১১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. উনষাট
১২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. একশ ষোলো
১৩. রণেশ দাশগুপ্ত, *উপন্যাসের শিল্পরূপ*, কালিকলম, ঢাকা, ১৯৭৩, পৃ. ২৩৩
১৪. জহিরুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. একশ পঁচিশ
১৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. একশ বত্রিশ
১৬. আহমদ ছফার *ওঙ্কার* উপন্যাসের স্টুডেন্ট ওয়েজ সংস্করণ ১৪০০-এর শুরুতে মুদ্রিত *দৈনিক ইত্তেফাক*-এ প্রকাশিত মন্তব্য
১৭. বিশ্বজিৎ ঘোষ, *বাংলাদেশের সাহিত্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ৪৪
১৮. আহমদ ছফা, *ওঙ্কার*, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৪০০, পৃ. ৩৫
১৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫
২০. রফিকউল্লাহ খান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩৭-৩৩৮
২১. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, *চিলেকোঠার সেপাই*, ইউপিএল, ঢাকা, তৃ-মু ১৯৯৫, পৃ. ২৪
২২. আনু মুহাম্মদ, 'উনসত্তরের অভ্যুত্থান এবং আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের চিলেকোঠার সেপাই', *লিরিক*, সম্পাদক: এজাজ ইউসুফী, সংখ্যা ৮, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সংখ্যা, চট্টগ্রাম, পৃ. ১৯
২৩. রফিকউল্লাহ খান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৫
২৪. আনু মুহাম্মদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭
২৫. মেঘ মুখোপাধ্যায়, 'চিলেকোঠা থেকে মুক্ত উপন্যাস', *লিরিক*, সম্পাদক: এজাজ ইউসুফী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭০
২৬. মহীবুল আজিজকে লেখা আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের চিঠি, 'আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের কয়েকটি চিঠি', *নির্মাণ*, সম্পাদক: রেজাউল করিম সুমন, তৃতীয় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৪০৪, চট্টগ্রাম, পৃ. ৫০
২৭. বদরুদ্দীন উমর, '*আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'চিলেকোঠার সেপাই'-এ গ্রামীণ জীবন ও রাজনীতি*', তৃণমূল, *সম্পাদক: আনু মুহাম্মদ, ৪র্থ সংখ্যা, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সংখ্যা, জানুয়ারি ১৯৯৮, ঢাকা, পৃ. ২০-২১*
২৮. *আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬-৭৯*
২৯. *আনু মুহাম্মদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪-১৫।*